বাণিজ্য উন্মুক্ততার বিষময়তায় বাংলাদেশ

ewYR¨ D`vixKi‡Yi bv‡g Avg`wbi m‡ev”P ïénvi †b‡g G‡m‡Q 25%-‡q| AcwiKwíZ GB Db¥³ Zvi welgqZvq aK‡Z n‡”Q evsjv‡`k‡K... wj‡L‡Qb **আসজাদুল কিবরিয়া**

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে (আইএমএফ) সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন। তাদের সব পরামর্শ মেনে নিয়ে কাজ করলেও তারা বলে আরো করতে হবে, আরো করলে ভালো। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন আই ওয়ালিক গত রোববার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ আচরণেরই প্রতিফল ঘটালেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট-পরবর্তী এক সংলাপ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই তিনি বললেন, 'বাংলাদেশে আমদানি শুল্কহার এখনো উচ্চ। বিশেষত সম্পূরক শুল্ক ও আধা-শুল্ক প্রতিবন্ধকতা দিয়ে যে সংরক্ষণবাদী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা রপ্তানির প্রতিযোগিতাশীলতার জন্য ক্ষতিকর। এতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হবে।' তার সার কথা হলো বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবস্থা আরো উন্মুক্ত করতে হবে, আরো উদার করতে হবে। এটি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের দীর্ঘদিনের প্রেসক্রিপশন।

৩০০% থেকে নেমে ২৫%

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি যাই বলুন না কেন, বাংলাদেশ যে গত দেড় দশকে ব্যাপকভাবে আমদানি শুল্কহার কমিয়ে এনেছে তা সর্বজনবিদিত। আর এই তথাকথিত উদারীকরণের কার্যক্রমটি শুরু হয়েছিল বর্তমান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের হাত দিয়েই। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের মোট ১৫টি ধাপ ছিল, যেখানে সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০%। ১৩ বছর পর ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% আর শুল্কধাপ চারটি (০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২৫%)। এই যে সর্বোচ্চ শুল্কহার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৩২.৫% থেকে এক লাফে ২৫%-এ নামিয়ে আনা হলো এটা করা হয়েছে আইএমএফের পরমর্শে। আইএমএফের সঙ্গে সম্পাদিত পিআরএজিএফ চুক্তির আওতায় সাত পর্যায়ে ৪৯ কোটি ডলার সাহায্য পাওয়ার জন্য যেসব কঠিন শর্ত বাংলাদেশকে গিলিয়েছেন সাইফুর রহমান, এটি তার মধ্যে অন্যতম হলো। আইএমএফ অবশ্য ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জন্য সর্বোচ্চ শুল্কহার ৩০% এবং তার পরের বছর ২৫% করার কথা বলেছিল। অতি উৎসাহী সাইফুর রহমান সেবারই ২৫% করে স্থানীয় শিল্পের (বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি) কোমর ভেঙে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সঙ্গে আইএমএফের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুসারে আমদানিযোগ্য ৫৫টি পণ্যের ওপর ঋণপত্রের মার্জিন সম্পূর্ণ তুলে নিয়েছেন। এর ফলটা টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। রপ্তানির তুলনায় আমদানি দ্রুতগতিতে বেড়ে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়িয়ে তুলছে, যা লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য ও বিলাসদ্রব্যসহ বিদেশী পণ্যসামগ্রী হু হু করে ঢুকছে বাংলাদেশের বাজারে। লোকজন এখন অধিক ঝুঁকি নিয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে কোনো ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপন করার চেয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তা দোকানে বিক্রি করার জন্য।

অর্থমন্ত্রী অবশ্য ২০০৫-০৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শুল্কহার আর কমাননি। অন্যভাবে বললে, কমানোর সুযোগ তেমন ছিল না। তবে সম্পূরক শুল্ক কাঠামো পাঁচ স্তর থেকে কমিয়ে তিন স্তরে নিয়ে এসেছেন। এতে অবশ্য মন গলেনি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের। সে কারণেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন ওয়ালিক। অথচ শুল্ক কাঠামোর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- অভারিত গড় এবং আমদানি ভারিত গড় হারের দিকে লক্ষ্য করলে আমাদেরই বরং আঁতকে উঠতে হয়। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে গড়ে অভারিত ও ভারিত শুল্কহার ছিল যথাক্রমে ৪৭.৪% ও ২৩.৬%। এক যুগ পেরিয়ে এসে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এটি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫২% ও ৯.১%। আবার ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৪৫.৪ কোটি ডলার, যার মধ্যে উন্মুক্ততার হার ছিল ২০.১%। আর ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা হয়েছে ৩০%। এই সময়কালে যে হারে রপ্তানি বেড়েছে, তারচেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছে আমদানি। আমাদের দেশে যে আমাদানি বেশি হবে তা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশেষ করে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যসামগ্রীর জন্য আমদানির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য ও অনুৎপাদনশীল সামগ্রী আমদানি যেভাবে বাড়ছে

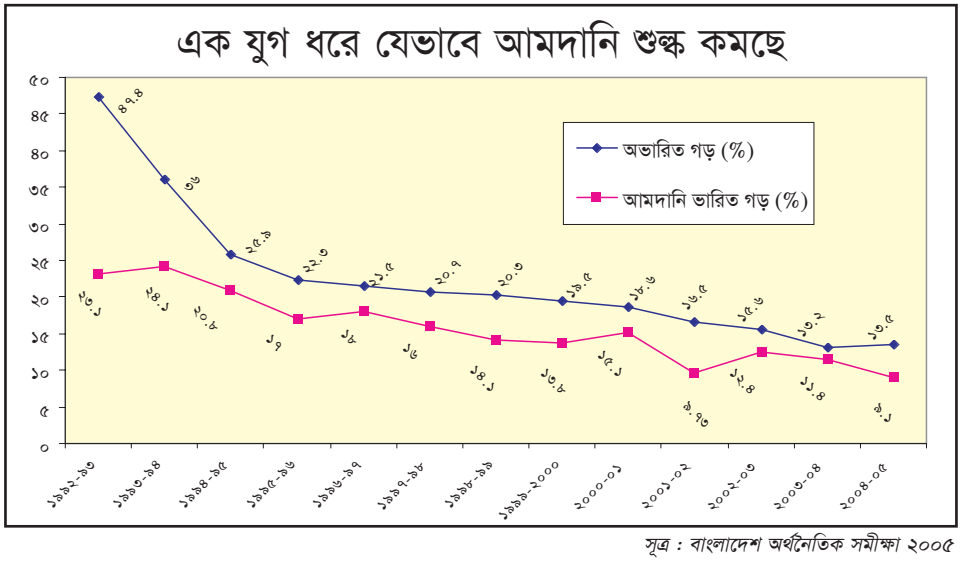

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫

উদারীকরণের প্রাপ্তি ও অবলুপ্তি

যা পাচ্ছি	যা হারাচ্ছি
সুপারমার্কেট, শপিং মল	শিল্প-কারখানা
গাড়ির দোকান	যন্ত্র কারখানা
উফশী বীজ	দেশীয় প্রজাতির বীজ
আকাশচুম্বী ভবন	সাধারণ গৃহায়ণ
ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, কোচিং সেন্টার	প্রচলিত বিদ্যালয়
নগরবাসী	প্রকৃত আয় ও মজুরি
নারী শ্রমিক	নারীর নিরাপত্তা ও মজুরি
এনজিও	স্থানীয় উদ্যোগ
প্রাইভেট ক্লিনিক	সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা

সূত্র : গ্লোবালাইজেশন ম্যাট্রিক্স- আনু মুহাম্মদ (২০০৪)

তা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজে যে আয়-বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে তাতে উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এতো বেশি অর্থ জমেছে যে, তা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করেও শেষ করা যাচ্ছে না। সে কারণেই বোধহয় রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে এখন দামি শপিং মল, চোখধাঁধানো বিপণি বিতান আর বাহারি খাবারে দোকান গড়ে উঠছে একের পর এক। অর্থনীতি হয়ে পড়ছে ভোক্তামুখী। আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এ দুই সংখ্যা আগেই বলেছিলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বৈষম্যমূলক ও শহরমুখী হয়ে পড়ছে, আর অর্থনীতি একটি 'দোকানদারি অর্থনীতিতে' রূপ নিচ্ছে। এটি হলো বাণিজ্য উন্মুক্ততার বিষময়তা, যেখানে শিল্প উৎপাদন করে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার বদলে দোকান খুলে বেচা-বিক্রি উৎসাহিত করা হয়। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে সেবামুখী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তা শিল্প খাতকে পাশ কাটিয়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক ধারার বিপরীতে এ অগ্রযাত্রা যথেষ্ট উদ্বেগজনক।'

পিআরএসপিতে নেই, বাজেটেও অনুপস্থিত!

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দাবি করেছেন, নতুন বাজেট দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) দলিলের আওতায় করা হয়েছে। ফলে পিআরএসপিতে গুরুত্ব পাওয়া বিষয়গুলো বাজেটে গুরুত্ব পাওয়ার কথা। উল্টো করে বললে, পিআরএসপিতে যা নেই বাজেটেও তা থাকার কথা নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। বাণিজ্য উন্মুক্ততার বিষয়টিই ধরা যাক। পিআরএসপিতে এ বিষয়ে কাজের কথা তেমন কিছুই বলা হয়নি। যা বলা হয়েছে তা ভাসা ভাসা ও অস্পষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো দিকনির্দেশনা নেই যে নয়া-উদারবাদী (নিউ লিবারেলিজম) গ্রহণ করার ফলে আমরা কোথায় যাচ্ছি ও যাবো। ঠিক একই অবস্থা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে। বাণিজ্য উদারীকরণের বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোনো ধারণাই মিলল না বাজেট থেকে। অবশ্য পিআরএসপির পলিসি ম্যাট্রিক্সে বলা হয়েছে, ২০০৫-০৭ সময়কালের মধ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়ে ২০%-এ নামিয়ে আনতে হবে। মানে হলো, সর্বোচ্চ শুল্কহার ২০% করতে হবে। যেহেতু পিআরএসপিতে এটি বলা হয়েছে, সেহেতু সরকার এটি করবেই। এবারের বাজেটে কিছু না করলেও ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে সাইফুর রহমান সে পথে যে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাণিজ্য উদারীকরণের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে সহজ ভাষায় ধারণা দিতে সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান (সুপ্র) বলছে, 'মুক্তবাজার বা বাণিজ্য উদারীকরণে জাতীয় নীতিমালা না থাকার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো স্থানীয় কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত করে যা খুশি তাই করবে (যেমন, বাংলাদেশে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো করছে) এবং জাতীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং শোষণ সুদৃঢ় হবে (যেমন, ইউনক্যাল ও নাইকোর অবহেলার কারণে মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র ছারখার)।... খুচরা যন্ত্রাংশ এনে যেসব এসেম্বলিং কারখানা চলতো তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ও যাবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আমদানি শুল্কহার কমানোয় দেশে ছোট ও মাঝারি প্রায় ৭ লাখ কল-কারখানা বন্ধ হতে বসেছে।' সুপ্র আরো বলেছে, 'সরকার যতোই ক্ষুদ্র উদ্যোগী সৃষ্টি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। উচ্চাভিষাষী ক্ষুদ্র উদ্যোগী কার্যক্রম নেওয়ার আগে সরকারের উচিত এ রকম উদার আমদানিনীতির প্রভাব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ওপর কতখানি পড়ে তা বিশ্লেষণ করা।' তার মানে এই নয় যে, বাণিজ্য উদারীরকরণ সব সময়ই মন্দ। আমরাও সেটা মনে করি না। সমস্যা হলো নিজস্ব প্রস্তুতি ছাড়া এটা করার ফল খারাপ হয়েছে ও হচ্ছে। ভারত যখন মনমোহন সিংয়ের হাত ধরে ১৯৯২ সালে উদারীকরণের পথে যাত্রা শুরু করল ততোদিনে টাটা-বিরলাসহ শক্তিশালী অনেকগুলো শিল্পগোষ্ঠী শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয় শিল্প বিশ্বায়নের ধাক্কা সামলানোর উপযোগী হয়ে গেছে অনেকটাই। আমাদের সে অবস্থা হয়নি। এর জন্য শুধু সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন নীতিই দায়ী নয়, আমাদের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের 'অল্প সময়ে বেশি লাভ' করার প্রবণতাও দায়ী।